গনতন্ত্রের ভাওতা

মখদুম আজম মাশরাফী

ভরসার ভার–৩

সম্প্রতি বাংলাদেশে গনতন্ত্র চর্চার যে দুর্দিন তা বিগত দশকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ভাঙ্গনের সাথে পাশাপাশি রেখে পরীক্ষা করা চলে। 'গনতন্ত্র' এখন পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর যাদুকরী একটি শব্দ। পেছনে তাকালে দেখা যাবে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের দিন ফুরিয়ে আসে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মেরুকরনের ধারায়। বিলেতে তখনও ওয়েষ্টমিনিষ্টার পদ্ধতির সংসদীয় গনতন্ত্র চালু ছিল। কিন্তু দুরদুরান্তের বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে চালু ছিল দমনমূলক শাসনব্যবস্থা। সে ব্যবস্থা যে গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল তা বলা যাবেনা। বৃটিশ ভারত ছেড়ে যাবার আগে নিয়ন্ত্রিত ভাবে ভারতে গনতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার প্রক্রিয়া শুরু হয়। স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানে গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা করেন দুই স্বাধীন সরকার এই দুটি নতুন দেশে। বৃটিশ ভারত প্রতিষ্টার আগে ভারতবর্ষে আসলে ছিল রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।

ভারতের গনতন্ত্র তার শিশুবস্থা থেকে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে একটি সুসম ব্যবস্থায় উপনিত হতে পেরেছে। ভারতে কোন সামরিকতন্ত্রের হস্তক্ষেপ হয়নি বা হওয়া সম্ভব হয়নি বলেই গনতন্ত্র মোটামুটি একটি প্রাতিষ্টানিক রুপ লাভ করেছে। কিন্তু অখন্ড পাকিস্তানে ঘটেছে বিপরীত। বারবার সামরিক শাসন, উভয় অংশের বৈষম্য, অসন্তুষ্টি, সাংস্কৃতিক সংঘাত দেশটিকে শুধু বিভক্তই করেনি, করে রেখেছে অনগ্রসর ও ব্যবস্থাপনাহীন। রাজনীতি খন্ডিত এ দুটি অংশে কোন প্রাতিষ্টানিক রুপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। অবসরপ্রাপ্ত আমলা, সামরিক কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তারা তাদের বুরোক্রেটিক মানসিক কাঠামো নিয়ে আসেন রাজনীতিতে। দেশের ক্রমাগত এ অব্যবস্থার মধ্যে ঘটে অপরিমেয় ব্রেন ড্রেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পৃথীবির এমন কোন উন্নত দেশ নেই, এমন কোন উন্নত প্রতিষ্টান নেই যেখানে বাংলাদেশের বাঙ্গালীরা শিক্ষক, বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছেন না। এদের বেশীর ভাগই সে দেশে শিক্ষার্জন করতে গিয়ে আর দেশে ফেরেন নি অথবা ফিরে এলে অর্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগাবার তেমন কোন সুযোগ পাননি বলে অনেকে বিদেশে ফিরে গেছেন।

৭১ এর পর বাঙ্গালীরা সম্পূর্ন ভাবে আত্মনিয়ন্ত্রনের যে সুযোগ পান, সেখানেও গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সব সময় কার্যকর ছিল না। গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা, দুর্বৃত্তায়ন গনতন্ত্রকে করে তোলে রুগ্ন আর মূমুর্ষ। দলীয় স্বার্থপরতা, ব্যক্তিগত লোভ লালসা, স্বৈরাচারী মধ্যযুগীয় বর্বর মনোবৃত্তি গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফলকে নির্মমভাবে গুড়িয়ে দেয়। 'গনতন্ত্রের' জন্য আজীবন সংগ্রামরত নেতার হাতেই আসে গনতন্ত্রের শ্বাসরোধ। অবিসংবাদিত নিরংকুশ জনসমর্থনকে তিনি একনায়কের মত অপব্যবহার করেন। বাঙ্গালীর আত্মনিয়ন্ত্রনের প্রথম পরীক্ষায় যে অপরিসীম বিশৃঙ্খলা ও ব্যর্থতা দেখা দেয় তার নিরাময়ে উপায়ন্তর না দেখে নেতা শিশু গনতন্ত্রের কন্ঠকেই রোধ করেন। অবলিলায় উপেক্ষা করেন দলীয় ও ব্যক্তিগত অগনতান্ত্রিক আচরনের প্রকৃত ব্যর্থতা।

এছাড়া রাজনৈতিক হত্যা এই তিনটি দেশকেই সমান ভাবে বিপর্য্যস্ত করেছে। কিন্তু ভারতের গনতন্ত্রে এই হত্যার কুফল ততটা সুদুর প্রসারী হতে পারেনি। কারন সেখানে গনতান্ত্রিক শাসকরা স্বৈরাচারী ছিলেন না। কিন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশের গনতান্ত্রিক স্বৈরাচার আর দুর্বৃত্তায়ন ডেকে আনে এই রাজনৈতিক হত্যাকান্ডগুলি। তবুও কেউই সে দুঃসময় থেকে শিক্ষা গ্রহন করেননি। তাই গনতন্ত্র কে ব্যর্থ করার প্রক্রিয়ায় পূনরাবৃত্তি হয়েছে মাত্র।

বাংলাদেশে গনতন্ত্রের শৈশবাবস্থায় বিশৃঙ্খলার যে দুর্যোগ আসে তাতে রাজনৈতিক রোমান্টিক রা যুক্ত করেন আরেক মারাত্মক মাত্রা। একদিকে চলতে থাকে ব্যর্থ গনতন্ত্রীদের স্বৈরাচারী আচরন। আর

অন্যদিকে সংগঠিত হয়ে উঠতে থাকে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীদের' রোমান্টিক চরমপন্থা। গনবাহিনী আমদানী করে হত্যার রাজনীতি। গনতান্ত্রিক শক্তির একটি অংশ সহসা হয়ে ওঠে অস্ত্রধারী রোমান্টিক। শুরু হয় পঙ্গপালের মত গনআত্মহননের মাতাল উৎসব। একদিকে রক্ষীবাহিনী অন্যদিকে গনবাহিনী আমাদের গনতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রনকে নিয়ে যায় আত্ম সংঘাতের কালো অধ্যায়ে। অতিদ্রুত এই মাতলামীকে প্রত্যাখান করেন গনমানুষ। এই উভয় শক্তিরই দ্রুত বিপর্যয় নেমে আসে আর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে অপসারিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হয় ইতিহাসের আস্তাকুড়ে।

যেহেতু বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি বিকশিত হয়নি, পর্য্যায়ক্রমে বাঙ্গালী সামরিক শাসক দু'জন এই সুযোগকে ব্যবহার করে গনতন্ত্রের মূলো ঝুলিয়ে দেশ শাসন করেন বেশ কিছু সময়। তারপর উর্দি খুলে নেমে পড়েন মাঠে। একজন বলেন 'আমি রাজনীতিকে কঠিন করে তুলবো'। তিনি তা করেছিলেন 'বিজয়ী' ও 'পরাজিত' শক্তির ভারসাম্যের সার্কাস কসরত করে। বিজয়ী দল মানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল এই খেলায় মেতেছিল বেশ। পরাজিত দল তাদের জন্যে সৃষ্ট অবস্থার আনুকুল্যে সজীব করে তোলে তাদের সুদুর অপলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যেন বাঙ্গালী জাতি দুটি কাবাডি দলে বিভক্ত হয়ে মালকোচা মেরে, গায়ে তেল মালিশ করে নেমে পড়ে মাঠে। চলে অনবরত পিচ্ছিল কসরত। মুক্তিযোদ্ধা বীরবিক্রম কালো চশমা পরে বাঁশী মুখে চালিয়ে যান এই বিজয়ী ও পরাজয়ীর মল্লযুদ্ধ। তারপর শেষে তিনি নিজেই হয়ে যান মরহুম নেতা। শিঘ্রই এরশাদ মুখে তুলে নেন সেই বাঁশী। তিনি গনতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠান আরও সাজসজ্জা করে। দীর্ঘ দশবছর ধরে দুর্বৃত্তায়ন পায় প্রাতিষ্ঠানিকতা। গণরোষানলের উত্তাপে তিনি জেলে গেলে কারারুদ্ধ গনতন্ত্র জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ঘরে ফেরে। রুগ্ন, অপরিনত সে গনতন্ত্র নড়বড়ে পায়ে হাটতে থাকে পথে। এবারে দুই বেগম শুরু করেন লুকোচুরি খেলা। পন করেন পরস্পরের মুখ দেখবেন না। সংসদ গোল্লায় যাক। গনমানুষ যাক চুলোয়। বিরোধী বেগম সংসদে মুখোমুখি প্রশ্নোত্তর পর্বের চেয়ে রাজপথের একতরফা ভাষনকেই গনতন্ত্রের মুক্তকণ্ঠ মনে করেন। সংসদীয় আইন-শৃঙ্খলার চেয়ে হরতাল, অবরোধ, জ্বালাও, পোড়াও নৃশংশতাকে তিনি জাতীর পূনর্গঠনের প্রক্রিয়া মনে করেন। প্রতিপক্ষে ক্ষমতাসীনরা পথের প্রতিরোধ গড়ে তোলেন জনসমর্থন আদায়ের জন্য। অসহিষ্ণুতা আর নৃশংসতা হয়ে ওঠে উভয়দলীয় আচরন। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে দেশ, জনগণ হয়ে পড়ে জিম্মি আর সংসদ প্রাচীন দুর্গের মত অরক্ষিত পড়ে থাকে তথাকথিত গনতন্ত্রের প্রাসাদ হয়ে।

ক্ষুদার্থ জাতির আর্তনাদ, গনতন্ত্র নয়রে বাবা দুমুঠো অন্ন চাই

ক্রমশঃ - -

মখদুম আজম মাশরাফী, পার্থ, ৮ই মার্চ ২০০৭